বাংলা সাহিত্যে নদী
বিষয়ের গভীরে

সংকলন ও সম্পাদনা

ড. সৌরভ মণ্ডল

রাকেশ চন্দ্র সরকার

বাংলা সাহিত্যে নদী বিষয়ের গভীরে

সংকলন ও সম্পাদনা
ড. সৌরভ মণ্ডল
রাকেশ চন্দ্র সরকার

নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ

Bangla Sahitye Nadi : Bishoyer Govire
by Dr. Saurabh Mandal & Rakesh Chandra Sarkar
Published by Natya Katha Prakashan Bibhag

প্রথম প্রকাশ : ১লা এপ্রিল, ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : তন্ময় পাল

ISBN : 978-98-83200-22-4

নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগের পক্ষে সৌমিত্রকুমার চ্যাটার্জী (মো. ৭২৭৮৭৬৩১৩১) কর্তৃক 'শেফানিলা', ২১/ই এম. এম. ফিডার রোড, কলকাতা-৭০০০৫৭ থেকে প্রকাশিত এবং তনুশ্রী প্রিন্টার্স ২১বি, রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ৩০০ টাকা

অন্দরমহল

প্রসঙ্গ নদী ঃ রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'
তনুশ্রী কুইরী ১৩
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : সমাজ ও জীবন-জিজ্ঞাসা
ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ মুখার্জি ২৩
পদ্মা তীরবর্তী মানুষদের জীবন অধ্যয়ন : পদ্মা নদীর মাঝি বিশ্লেষণের আলোকে
প্রিয়া পাত্র ৩৩
পূর্ববঙ্গ গীতিকায় নদী-প্রসঙ্গ
হুমায়ুন কবির ৪৪
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি : বিষয়ে বিশ্লেষণে
পূর্ণিমা ব্যানার্জী ৫৮
'তিতাস একটি নদীর নাম' : আড়ালে ধীবর জীবনের কথা
বাবলু হক ৬৯
বাংলা উপন্যাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নদী
আজমিরা খাতুন ৭৫
জীবিকার অন্য স্বরঃ তিতাস একটি নদীর নাম
ড. অঞ্জলি হালদার ৮৮
সুন্দরবন কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যে নদ নদী: একটি বিশ্লেষণী পাঠ
ড. স্বপ্না বেগম ৯৩
অদ্বৈত মল্লবর্মনের তিতাস পাড়ের মালোজীবন-চর্যা
টুম্পা দে ১০১
মরা গাঙের ইতিকথা : প্রসঙ্গ 'তিতাস একটি নদীর নাম'
ড. উত্তম পালুয়া ১১০
নির্বাচিত চারটি নদীমাতৃক উপন্যাসে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবনের স্বরূপ সন্ধান
লাবনী বৈদ্য ১১৮
ধীবর জীবনে নদীর প্রভাব : 'তিতাস একটি নদীর নাম'
ললিতা পাল ১৩৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা' : পাঠকের চোখে
ড. নির্মল দাস ১৪১
সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাস : সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র
ড. বাবুল মণ্ডল ১৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইছামতী : সমকালের কণ্ঠস্বর
ড. উত্তম দাস ১৬৫
তিলোত্তমা মজুমদারের 'রাজপাট' বিপর্যয় ও বিচ্যুতির আখ্যান
পাপ্পুসোনা গান্ধী ১৭৬
বাংলা উপন্যাসে নদীচিন্তা ও পদ্মানদীর মাঝি
বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ২১৪
তিতাস ও গঙ্গা : মালোজীবনের তুলনামূলক মূল্যায়ন
শুচিতা সিং ২২৩
'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উচ্চবিত্ত সমাজ :
নিম্নবর্গের সীমানা ছাড়িয়ে
পিয়ালী খাঁ ২৩২
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মহানন্দা : নদী ও রাজনীতি
ড. গোবিন্দ বিশ্বাস ২৩৮

বাংলা উপন্যাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নদী

আজমিরা খাতুন

নদী, নদীনির্ভর মানুষ ও তাদের জীবন- জীবিকা, প্রেম-অপ্রেম,সংস্কার-সংস্কৃতি নিয়ে বহু উপন্যাস লেখা হয়েছে। এদেশে এবং বিদেশে। বিশ্বসাহিত্যে নদী নিয়ে বেশ কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছে যা আজও নদী ও মানুষের সম্পর্কের স্রোতকে চিহ্নিত করে। মার্ক টোয়েনের 'লাইফ অফ দ্য মিসিসিপি', কেনেথ গ্রাহামের 'দ উইন্ড ইন দ্য উইলোস', জেরোম কে জেরোমের 'থ্রি মেন ইন আ বোট', মিখাইল শলোকভের "অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন', আনা সেগার্সের 'ফিশারমেন অফ সান্তা বারবার' এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তো অবশ্যই। এদেশে বাংলা ছাড়া অন্য ভারতীয় ভাষায় নদী নিয়ে লেখা অন্যতম উপন্যাস হিসেবে উল্লেখযোগ্য মালয়ালাম ভাষায় লেখা শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের 'চেম্মিন' (চিংড়ি), অসমিয়া ভাষায় লেখা ইন্দিরা গোস্বামীর 'চিনাবর স্রোত' (চিনারের স্রোত), নেপালি ভাষায় লেখা লীলাবাহাদুর ছেত্রীর 'ব্রহ্মপুত্রকো চেন্তিনা' (ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ের কাছাকাছি)।

নদীর রয়েছে নিজস্ব এক অদ্ভুত রহস্যময়ী রূপ। যেখানে সে মানুষকে যেমন বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায় তেমনই কখনও কখনও ধ্বংসের রাহুগ্রাসের মতো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। নদীভিত্তিক উপন্যাসে এই সত্য আছে।

নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য নদী। নদীজীবন এবং তার অনুষঙ্গ সেখানে নানাভাবে উঠে আসে। কখনও প্রধান ভূমিকায় কখনও বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে, আবার কোথাও নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কাব্যময় ভাষায় এক মুগ্ধতা আবেশ চিত্রিত। কোথাও ঘটেছে তার শুভঙ্করী অথবা প্রলয়ংকরী রূপের প্রকাশ। কোথাও বা বহমান জীবনধারার ভাঙাগড়ার প্রতীক রূপে নদী হয়ে উঠেছে বাঙ্ময়। আবার কখনও পটভূমি কিংবা চরিত্রের মানস অভিব্যক্তির প্রকাশরূপ হিসেবে নদী হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূণ। কখনও বা নদী নিজেই হয়ে উঠেছে মানবী প্রিয়ার মতো চরিত্র। এছাড়া নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানান সংস্কার, বিশ্বাস, পূজা-পার্বণ, অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে প্রায়শই সে হয়ে উঠেছে লোকসংস্কৃতি

এক আঁধার। কোনও কোনও ক্ষেত্রে লেখকদের জীবন ভাবনার দ্যোতক হিসেবেও নদীর এক তাৎপর্যময় ভূমিকা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের পাতায় ভেসে উঠেছে। এই ধারার উপন্যাসও স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা বাংলা সাহিত্যে নদীভিত্তিক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত।

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নদী এক অপরিহার্য বিষয়। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই নদীর ভূমিকা স্পষ্ট। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে বৈষ্ণব পদাবলী, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য তার দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে যখন উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়, সেখানেও নদী এসেছে অপরিহার্যতার অংশ হিসেবে। কখন ও নদীকে ঘিরে উপন্যাস রচিত হয়েছে। কখনও উপন্যাসের চরিত্রের প্রয়োজনে নদী এক প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছে যা উপন্যাসের যুক্ত করেছে এক নতুন মাত্রা।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদী আর মানুষের জীবন এদেশে যেন সুতোতে বাঁধা। কোনও বাঙালি সাহিত্যিক উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু নদীকে স্পর্শ করেননি এমন দৃষ্টান্ত বিরল। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধূত, প্রথমনাথ বিশী, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আবু ইসহাক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার, অভিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বতা দেবী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেবেশ রায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, শিবশংকর মিত্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র, শচীন দাশ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কথাসাহিত্যিকদের প্রায় প্রত্যেকের লেখায় কমবেশি নদীর কথা আছে। বিশেষ করে স্বাধীনতা- উত্তর বাংলা উপন্যাসে নদী এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব নদীর কথা এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পদ্মা, কালিন্দী, কোপাই, তিস্তা, গঙ্গা, রায়মঙ্গল, ইছামতি, ধলেশ্বরী, মেঘনা প্রভৃতি।

আমাদের আলোচনার বিষয় যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নদী এবং নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের বৈচিত্র্যময় জীবন তাই এই অঞ্চলের নদী। এক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা পালন করেছে তা দেখে নেব।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার, বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলের নদী ঘিরে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন আবর্তিত। নদী এখানকার মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।

নদীর কোলে এদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। এই অঞ্চলের নদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুগলি, পিয়ালী, মাতলা, ইছামতি, যমুনা। এছাড়াও আরও অনেক নদী আছে যেগুলি পদ্মা আর গঙ্গার শাখা নদী। এসব নদীকে কেন্দ্র করে বহু উপন্যাস লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মনোজ বসুর 'বন কেটে বসত, 'জলজঙ্গল', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ নদী সবুজ বন', শক্তিপদ রাজগুরুর 'নোনা গাঙ', বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাগদ', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জল জঙ্গলের কাব্য', প্রফুল্ল রায়ের 'মাটি আর নেই', শচীন দাসের 'অন্ধ নদীর উপাখ্যান', তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'নদী মাটি অরণ্য, শিবশংকর মিত্রের 'বেদে বাউলে', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ', ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'চর পূর্ণিমা', অমর মিত্রের 'ধনপতির চর'। এইসব উপন্যাসের মধ্যে কয়েকটি নিয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে।

অলৌকিকত্বে ঘেরা বাদাবনের জেলে- মাঝিদের বিচিত্র জীবন, অদ্ভুত বিশ্বাসের নানা দিক নিয়ে লেখা মনোজ বসুর উপন্যাস 'জলজঙ্গল'। মূলত নীলকমল, কচি পাতা, গোসাবা প্রভৃতি নদীবেষ্টিত সুন্দরবন অঞ্চলের জনজীবন লেখকের অভিজ্ঞতায় এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সুন্দরবন তার আদিম রূপ নিয়ে এখনও মানুষের মনে ভয় ও সৌন্দর্য জাগিয়ে তোলে। তাই উপন্যাসের মধ্যে দেখি দু'কড়ির মতো অভিজ্ঞ মাঝি 'বাঘবন্ধন' মন্ত্র পড়ে মাছ ধরার নৌকায় ওঠার কথা ভাবে। আবার মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে 'খিলমন্ত্র' আওড়ে বাঘকে বশ করতেও চায়। এদের দেখলে মনে হয় ভয়ংকর জীবনঘাতী পেশ আর অদ্ভুত অলৌকিক সংস্কার বিশ্বাসের ওপর এরা নিজেদের জীবনকে সঁপে দিয়েছে।

এখানকার মানুষের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন নদী। নদীতে মাছ ধরে, নদীপথে দূরে গিয়ে কাঠ, মধু, মোম সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে এরা। নদী এদের জীবনে সর্বত্র যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম। এই নদীগুলির সঙ্গে সমুদ্রের যোগ আছে। নদীর জোয়ার-ভাটার মতো এদের জীবনে প্রেম, হিংসা, লোভ আসে, যায়ও। কোনওটির অবস্থান স্থায়ী নয়। এমনকি বাসস্থানও নয়। এরা নিজেদের ইচ্ছায় যেকোনও জায়গায় বসবাস করতে পারে না। থাকতে হলে ভেড়ি মালিক বা বাবু মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হয়। যেমন এই উপন্যাসের জেলে- চাষিরা তাদের থাকা বা কাজের জন্য জমিদার মধুসূদনবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। আবার খুশালের মতো অবস্থাপন্ন লোক জমির ইজারা দিয়ে মাছের বাজার তৈরি করে। যেখানে জেলেরা মাছ জড়ো করে বিক্রি করে। যেখানে জেলেরা মাছ জড়ো করে বিক্রি করে। এর সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে তাদের

অলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার। তারা মনে করে এই সব কিছু হয় বনবিবির কৃপায়। আসলে নদী, বন এবং মানুষের এক বিচিত্র সহবস্থান লক্ষ করা যায় 'জলজঙ্গল' উপন্যাসে।

এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নদীকে কেন্দ্র করে লেখা মনোজ বসুর আরও একটি পরিচিত উপন্যাস হল 'বন কেটে বসত'। সৃষ্টির আদিম লগ্নে মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বন কেটে বসত তৈরি করেছিল। এই প্রবৃত্তি মানুষের মজ্জাগত। জীবিকার জন্য, বসতি গড়ার জন্য মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়। এই উপন্যাসে রয়েছে সেই সংগ্রামের কথা। তার জন্য বন্য পশুদের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম জীবিকার সংস্থানেরই চিত্র। যার মূলে আছে বিদ্যাধরী ও গোসাবা নদী। জীবিকার জন্য প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে মানুষ এই অঞ্চলে আসে, আলঘর বাঁধে, মাছের ভেড়ি তৈরি করে। ফলে এদের সঙ্গে ভেড়ি মালিকের সংঘর্ষ হয়। তার মধ্যে ফুটে ওঠে নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনসংগ্রামের ছবি। যেমন জগন্নাথ, বলাই মালিকের নৌকায় মাঝিগিরি করে। উজান ঠেলে দিনরাত নৌকা বেয়ে পরিশ্রম করেও বেঁচে থাকার জন্য সামান্য চিঁড়ে, মুড়িও জোটাতে পারে না। আবার নিজেদের পাওনা চাইতে গিয়ে মালিক ছোট চৌধুরীর ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। আবার জগন্নাথ উপন্যাসে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে হাজির। চারুবালার সঙ্গে তার নতুন বসত গড়ার একটা ইঙ্গিত আছে।

এদের প্রধান জীবিকা নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা, ভেড়িতে চাষ করা। মাছ যেহেতু দ্রুত পচনশীল বস্তু তাই শেষরাতে বা ভোরে ডিঙিতে মাছ ভর্তি করে নদীপথে ছুটতে হয় গঞ্জের দিকে। এ লেখায় সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে নদীনির্ভর বিশ্বাস, সংস্কার ও লোকাচার। এরা বিশ্বাস করে বাঘের জিভ হল প্লিহার ওষুধ, বাঘের গোঁফ ঘায়ের ওষুধ। বাঘের নখ বাচ্চাদের কোমরে থাকলে বিপদে নিশ্চিন্তে থাকা যায়। বাঘের চর্বি বাতের ওষুধ। এছাড়া আছে বুড়ো হালদারের কথা, যাকে সন্তুষ্ট করলে নদীতে ভাল মাছ পাওয়া যায়। আছে ওলাবিবির কথা, যাকে ঠেকানোর জন্য রয়েছে গ্রাম বন্ধ করার কথা। বাঞ্ছারাম ওলাবিবিকে দেখার অপরাধে ভেদবমি হয়ে মারা যায়। প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে অপরাজেয় মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এই উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রায়মঙ্গল, বিদ্যাধরী, কদমতলী, দুগ্যদুয়ানি, হাড়োয়া, মালঞ্চ, বেতনী, মাতলা এবং আরও অনেক ছোট ছোট নদীকে কেন্দ্র করে লেখা শিবশংকর মিত্রের উপন্যাস 'বেদে বাউলে'। মূলত সুন্দরবন আর বরিশালের মাঝে অবস্থিত সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় হাট বড়দলকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি আবর্তিত।

সপ্তাহে একদিন এখানে হাট বসে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চলে বেচাকেনা। দূরদূরান্ত থেকে নৌকা বেয়ে, পানসি করে লোকেরা আসে। এই হাটের দোকানেই কাজ করে অনিল (বেদে)। নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, শিকার করা তার শখ। আর এই শখ পূরণ করতে গিয়ে মালিকের ছেলে অবিনাশের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এই কাজে সে তার সঙ্গী হয়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে খুলনায় দাঙ্গার সময় সবাই বড়দল ছেড়ে কলকাতা, বারাসাতের দিকে পালিয়ে যায়। কিন্তু বেদে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে হাঁটে। সে এই নদী, বন ছেড়ে কোথাও যেতে নারাজ। তার কথায়— "না না বন ছেড়ে কোথাও যাব না। ... বনই আমার ভরসা, বন আছে আর আছে আমার এই ডিঙি।... কে আমাকে জীবন যুদ্ধে হারাবে!"

বিদ্যাধরী নদী এদের কাছে বৃদ্ধা মায়ের মতো। বৃদ্ধা মাকে কেউ যেমন ছেড়ে যায় না তেমনই বিদ্যাধরীর ক্ষীণ জলধারাকে কেউ ছেড়ে না গিয়ে কলাকৌশলে তাকে বাঁচিয়ে রেখে তারই কূলে বসতি, বাজার, গঞ্জ গড়ে তুলেছে। সন্দেশখালি গঞ্জ সেইরকম একটি গঞ্জ। বনের কাঠ, পাতা, মোম, মধু সবই এখানে আসে। আসে রায়মঙ্গল নদীর স্রোতে বাংলাদেশের বহু সম্পদ। আর এখান থেকে সেই সম্পদ কলকাতায় চালান হয়।

এ লেখায় বাউলের চোখ দিয়ে কলকাতা দেখার কথা আছে। কলকাতায় গিয়ে সেখানকার নগরসভ্যতার ব্যস্ততা ও কর্মযজ্ঞের উন্মত্ততায় তার মনে হয় যেন সে আধুনিক জীবনের তীর্থ দেখতে এসেছে। উপন্যাসে রয়েছে আনন্দ-উৎসবে গোসাবার লোকের মন মাতিয়ে তোলার কথা। বাউলে আর ডাক্তারের চেষ্টায় থিয়েটারে তৈরির কথা। ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের স্কুল, সমবায় ব্যাঙ্ক, কৃষি উন্নয়নের কথা আছে। আছে সুন্দরবনের মাছ ও মধু সংগ্রহের অভিযান নিরাপদ করে তোলার কথা। আর এইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে এখানকার মানুষের জীবনযুদ্ধের কথা।

সুন্দরবনের কোলে বসবাসকারী মানুষের সংগ্রামী না হয়ে তো উপায় নেই। খরস্রোতা নদী, গভীর বন, জোয়ারের প্লাবনকারী উত্তুঙ্গ ঢেউ, প্রবল ঘূর্ণিবত্যার দাপট, বিধ্বংসী ঝড়ঝাপটা, সর্বোপরি ডাঙার ও হিংস্রতম জীবের মুখোমুখি না হয়ে তো জীবিকা অর্জন করা শুধু দায় নয়, বেঁচে থাকাও দায়। কিন্তু তা বলে এরা বসে থাকে না। বিপদে-আপদে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যায়। যেমন উপন্যাসের ভজহরি মিস্ত্রি। লেখক তাকে এই সংগ্রামী মানুষের এক বড় উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন।

রায়মঙ্গল, ছায়াক্রুপা, নদীকে কেন্দ্র করে লেখা শক্তিপদ রাজগুরু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'রায়মঙ্গল'। এই উপন্যাসে রায়মঙ্গল নদীর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় লেখক নদীর মধ্যে একটা প্রাণসত্তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। লেখকের বর্ণনায় পাই— "ভাটা আসতে আর দেরি নেই। থমথম করছে দিগন্তপ্রসারী রায়মঙ্গলের বুক। নিথর গাং আয়নার মত পড়ে আছে।" এই নদীর ধারে বাঁধ বেঁধে জমি তৈরি করে সেই জমিতে ফসল ফলায় এখানকার মানুষজন। কখনও কখনও রায়মঙ্গলের বিধ্বংসী বন্যা সব কিছু তছনছ করে দেয়। তার তীরে অবস্থিত সাহেবগঞ্জ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় কিন্তু এখানকার মানুষজন তবুও পরাজয় স্বীকার করে না। নতুন উদ্যোমে ও পরিশ্রমে সাহেবগঞ্জের নোনা মাটিতে আবার সোনালি ফসল ফলায়। মানুষের সাধনায় নোনা মাটির এই প্রতিদান অর্থাৎ ধরিত্রী মাতার কল্পনায় তৈরি হতে থাকে একটি পৌরাণিক কাঠামো। "সাহেবগঞ্জ আবার মাথা তুলেছে, বসত করেছে নতুন মানুষ। সবুজের স্পর্শে জেগে উঠেছে মৃত্তিকা— এ যেন অহল্যার নবজন্ম। তার ছোঁয়ার পাষাণের বুকে অংকুর জেগেছে। সুন্দরবন ও রায়মঙ্গল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।" এইভাবে পুরাণের সঙ্গে নদীর একটা যোগসূত্র তৈরি হয়েছে এই উপন্যাসে।

এই উপন্যাসের চরিত্ররা কেউ মাছ ধরে, কেউ বন থেকে মধু, মোম, কাঠ সংগ্রহ করে। কেউ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। নদী এদের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এদের জীবনে যখন প্রেম আসে তখনও তার সঙ্গে নদী উপনীত হয়। তাই জীবন যখন সোনাবউয়ের খোপায় সোঁদাল ফুলের গুচ্ছটি পরিয়ে দেয় তখন মনে হয়— "একটা দমকায় যেন সব নোনা ভেড়ির বাঁধ আলগা হয়ে গেছে। ছুটে আসছে লকলকে জিভ মেলে জলের সব ভাসমান প্লাবন...হাসছে সোনাবউ। অসীম তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে তার মন।" অর্থাৎ নদী এবং জীবন যেন অনায়াসে মিলে যায় এই উপন্যাসে। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর ভয় থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে সব রকমের মানবিক প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকে। মনে হয় নদীর মতো এরাও বহমান। তাই ঔপন্যাসিক অনায়াসে বলতে পারেন —"এক নৌকা যায়, অন্য নৌকা আবার বাদাম পালের ভর জোয়ারে ভেসে চলে, নদীর বুকে এইতো জীবন— এই সার্থকতা... একটি করে পাতা ঝরে আবার নতুন পাতা গজায়। বনে বনে এই নিয়ম। এখানকার মানুষের মনও তেমনি ধাঁচে গড়া।" এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যেন নদীর বহমানতার মধ্যে জীবনের বহমানতাকে অন্বেষণ করতে চেয়েছেন।

এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার এবং নিজস্ব কিছু লোকচারের পরিচয়ও উপন্যাসের মধ্যে পাই। যেমন বনে গিয়ে যদি কারও মৃত্যু হয় তাহলে তার সৎকারের পর গাছের ডালে কিছু চাল, জীর্ণ চাটাই, ছেঁড়া কাপড় রেখে আসা হয়। লেখকের কথায়— "এ যেন মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষুধার অন্ন, পরনের বস্ত্র, জীর্ণ শয্যা।"

বাদাবনের গাঙ, জলে ভেসে বেড়ানো মাঝি- মেছোদের কথা পাওয়া যায় শক্তিপদ রাজগুরুর 'নোনাগাঙ' উপন্যাসে। বাদা অঞ্চলে, বিশেষ করে বনের মধ্যে এরা নিজেদের ভেতরে থাকা বিভেদ, রেখারেষি, দ্বন্দ্ব, হিংসা সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে বিপদে- আপদে একে অপরের সহায় হয়। না হলে বনবিবির রোষে পড়তে হয়। এই উপন্যাসের মজিদ মিয়া সেইরকম এক চরিত্র। মজিদ মিয়ার বয়স হলেও আর্থিক দিক থেকে সে সচ্ছল। তাই অনেক টাকার বিনিময়ে তার সঙ্গে মরিয়মের বিয়ে ঠিক হয়। অন্যদিকে এই মরিয়ম সুরমানের ভালবাসার মানুষ। সে বেশি পরিমাণ পণ দিতে না পারায় মরিয়মের বাবা মজিদের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে। তবুও সুরমান হাল ছাড়েনি। সে মজিদ মিয়ার নৌকায় কাজে যায় বেশি টাকা উপার্জনের জন্য, যাতে মরিয়মের বাবাকে সেই টাকা দিয়ে মরিয়মকে বিয়ে করতে পারে। কাজ করতে গিয়ে কিছুদিন পর মজিদ মিয়া মালিকের কাছ থেকে বাড়ি ফেরার অনুমতি পেলেও মালিক সুরমানকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দেয়নি। দুঃখ, যন্ত্রণা, মরিয়মকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় সুরমান দিশেহারা হয়ে যায়। এমনকি মৃত্যুতেও সে আর ভয় পায় না। তাই বাঘ যখন তাকে আক্রমণ করে তখন সে কোনওরকম বিচলিত না হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মজিদ মিয়া শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ দিয়ে সুরমানকে বাঁচিয়ে দেয়। যদিও ঘটনাচক্রে সুরমানের সঙ্গে মরিয়মের বিয়ে হয়নি। কারণ মরিয়মের বাবা আরও বেশি টাকার বিনিময়ে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে মরিয়মের বিয়ে দেয়। বিয়ের রাতেই মরিয়ম নৌকাডুবি হয়ে মারা যায়। আর তখন থেকেই সুরমান বন্যজীবনকে মেনে নিয়ে বনের ডাকে সাড়া দিয়ে ঘর ছেড়েছে। ভালবেসেছে কালো নদী আর সবুজ বনকে। যেখানে নদীর বাঁকে বাঁকে থাকে কবর। বনে ছড়ানো থাকে মৃত্যু।

সমগ্র উপন্যাসের কাহিনি সুরমানের স্মৃতিচারণায় ভেসে উঠেছে। উপন্যাসের কোথাও মজিদ মিয়ার উপস্থিতি নেই। কিন্তু সমগ্র কাহিনি বৃত্তের মূলে আছে তার ট্র্যাজিক পরিণতি। আর আছে তার আত্মার শান্তির উদ্দেশে কেঁড়াসুতের নদীর কাছে একটি গাছের ডালে রাখা ছেঁড়া লুঙ্গি, জীর্ণ মাদুর, কিছু খাবার।

এই উপন্যাসেও রয়েছে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, সংস্কারের কথা। কেউ মারা গেলে তার আত্মার শান্তির জন্য গাছে জীর্ণ বস্ত্র, ছেঁড়া মাদুর আর পুঁটলিতে খাবার ঝুলিয়ে রাখা হয়। বনবিবির সন্তুষ্টির জন্য বনে মুরগি ছেড়ে দেওয়া হয়। বনে একে অপরের সঙ্গে কেউ ঝগড়া করলে বনদেবী রুষ্ট হয়। নির্জনে জিন, পরি থাকে তাই গান গাইতে নেই ইত্যাদি। সমগ্র উপন্যাসটি নদীপথে সুন্দরবন থেকে আইল্যান্ডে যাওয়ার বর্ণনা দিয়ে শুরু এবং শেষ। আছে চিনখালি, নসিপুর ও আরও অনেক ছোট নদীর কথা। নদী এখানকার মানুষের জীবনকে হয়তো সেভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে না। তবে নদী এদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে হিসেবে কাজ করে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বঙ্গোপসাগরের মুখে বসবাসকারী কৃষক আর মাছমারাদের জীবনের কাহিনি নিয়ে লেখা প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস 'মাটি আর নেই'। কুঞ্জ, কুবের, বিলাস, নটবর, গুপি, বিধবা নিশি এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। এরা কেউ জাতপাতে বিশ্বাসী নয়। বাগদি, বাউড়ি সবাই মিলে নয়াবসতে বাস করে। সামান্য মাটি তথা একটা নিশ্চিন্ত আশ্রমের খোঁজে এরা জন্মাবধি ঘুরেছে। শেষে নয়াবসতের সন্ধান পায়। নয়াবসত তাদের একান্ত আপন হয়ে ওঠে। এই জমিতে তারা প্রাণ দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু সমুদ্রের মুখে তা টিকিয়ে রাখা দুরূহ ব্যাপার। একদিকে এই বেওয়ারিশ মাটিটুকু ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সমুদ্র হাত বাড়ায়, অন্যদিকে হাত বাড়ায় ভেড়ি মালিক। ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভেড়ি মালিকের বিরোধ তৈরি হয়।

এই উপন্যাসে আড়তদারের কথা তেমন আসেনি। কিন্তু মুরুব্বি বা সাঁইদারের কথা আছে। কুবের এদের মুরুব্বি। সে এদের সুবিধা-অসুবিধা, দায়দায়িত্ব সব কিছু দেখাশোনা করে। এরাও তার কথা অমান্য করতে পারে না। তাই গুপি তার ভালবাসার মানুষ নিশিকে বিয়ে না করে সাঁইদারের মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়ে রাজি হয়। আবার গগন টিয়া নামে এক ভিন্ন জাতের মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাতে। জীবন এবং জীবিকার প্রয়োজনে এরা মাছ মারে, কৃষি কাজ করে। কিন্তু মাছমারা বা চাষবাস এদের পেশা নয়। এরা জানে, এই কাজের কোনও সম্মান নেই। তাই বাঁচার জন্য সুযোগ বুঝে এরা অন্য পেশাও গ্রহণ করে। যেমন গগন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গান গাওয়াকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। এরা চাষ করে, পরিশ্রম করে কিন্তু কারও কাছে হাত পাতে না। নদীতে মাছ ধরে চাঙারি ভর্তি করে, মাথায় করে দূরের হাটে বিক্রি করতে যায়। এতে এদের কষ্ট হয় কিন্তু লজ্জা হয় না।

উপন্যাসটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব, নদী বা সমুদ্র এখানকার মানুষের জীবনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তা জীবিকা অর্জন থেকে শুরু করে মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করা পর্যন্ত।

সুন্দরবনের বাদা অঞ্চল, বিশেষ করে হরিণচকের ভেড়ি অঞ্চলের জীবনধারা, নদীনির্ভর অর্থনীতি, মানব চরিত্রের জটিল আবর্ত, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং বাগদা চিংড়ির চাষকে কেন্দ্র করে লেখা বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'বাগদা'।

বাগদা চিংড়ির অনুপুঙ্খ বর্ণনা উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। সেই সূত্রে কাহিনি দানা বেঁধেছে। শিবু, বিনোদ, ব্রজলাল, কিশোররা অক্ষয়কুমার জলকরে কাজ করে। এরা কেউ জাত জেলে নয়। এদের বাপ-ঠাকুরদারাও কেউ মাছ ধরেনি কখনও। কেউ কাজ করত চায়ের দোকানে, কেউ করত বাবুদের বাড়ির দারোয়ানগিরি। বাঁচার জন্য এরা রাত জেগে কেউ জল পাহারা দেয়, কেউ মাছ বিক্রির জন্য হাটে যায়। ব্রজলাল, কিশোরের মতো মানুষেরা আঁটল, ধোসনা, পাঠজাল ইত্যাদি নিয়ে বাগদা সংগ্রহ করে। অনেক সময় সামান্য পয়সার এইসব চাকরিও থাকে না।

এখানে রাজনৈতিক দলাদলি, স্বার্থান্ধতা, কানভারী করা, প্রতারণা, দ্বন্দ্ব প্রায় লেগেই থাকে। সেই সঙ্গে মাস্তানদের ভেড়ি লুটের খবর পাওয়া যায় যখন-তখন। যেমন প্রায় এক বছর ভরত হালদারের বিঘে চারেক জমি লিজ নেওয়ার দু'হাজার টাকা ম্যানেজার প্রসন্নকুমারের কাছে দেওয়া হলেও টাকার আসল মালিক ভরত হালদারের কাছে তা পৌঁছয়নি। ভরত হালদারের ভাইয়ের নাম শিবু হালদার। শিবুর মেয়ে হাসির অবিবাহিত অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা উপন্যাসের কাহিনি বৃত্তে এক বিশেষ ট্র্যাজিক ভাবনার সঞ্চার ঘটিয়েছে। শিবুর স্ত্রী কামটের খপ্পরে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। নদীমাতৃক সুন্দরবন অঞ্চলে এভাবে প্রাণ হারানো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা মাত্র। সুন্দরবনের এসব নদীতে কুমির, কামট খেতে পারে জেনেও অভাবের তাড়নায় সামান্য পয়সার জন্য মানুষ আকছার নদীতে নেমে মাছ ধরে।

অন্যদিকে রয়েছে অক্ষয়বাবুদের জলকর। যার দৌলতে হরিণচকে কাঁটাদারদের বাজার, লরি- টেম্পোর যাতায়াত, বরফকল, সিনেমা হাউস গড়ে উঠেছে। এছাড়া এখানকার মানুষের অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বড় রকমের যা নাড়া দিয়েছে তা হল লঞ্চঘাটের সামনে বেওয়ারিশ জমিতে গড়ে ওঠে দেহপসারিণীদের আস্তানা। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি, জলকর, বাগদা চাষের প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং

সমান্তরালাভাবে জলকরে খেটে খাওয়া চরিত্রগুলির এক ট্র্যাজিক কাহিনিকে রূপ দিয়েছেন। পুলিশের ঘুষ নেওয়া, রেখারেষি, দেহব্যবসা, মস্তানি, রাজনৈতিক চর্চা, অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা— সবই উঠে এসেছে কাহিনির অন্দরে। এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে একদিকে নির্মম প্রকৃতি, অন্যদিকে সামাজিক শোষণ। তারই মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকার নিরন্তর লড়াই। ভেড়ি অঞ্চলের দাঙ্গা, ডাকাতি, রাজনীতি, চিংড়ি চাষের প্রক্রিয়া, পঞ্চায়েতের ওজন ও দলাদলি, কাঁটাদার, দেহব্যবসায় যুক্ত লঞ্চঘাটের মেয়েরা, ব্যক্তি সম্পর্ক, শ্রেণি সম্পর্ক মিলিয়ে 'বাগদা' উপন্যাস জীবন বাস্তবতার দৃষ্টান্ত। এখানকার প্রতিটি চরিত্র সজীব এবং বিশ্বাসযোগ্য। নদীর সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগ আছে।

গোসাবা, রায়মঙ্গল নদীবেষ্টিত নাজনেখালি, জয়মণিপুর, মামুদপুর অঞ্চলের মানুষের জীবনের কাহিনি নিয়ে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'জলজঙ্গলের কাব্য'। নাজনেখালির সুভাষ, বিদ্যুৎ, মনোরঞ্জন এবং আরও কয়েকজন মিলে সুন্দরবনের তিন নম্বরে কাঠ কাটতে যায়। সেখানে মনোরঞ্জনকে বাঘে খায়। বিয়ের বছরে বনে যাওয়া নিষেধ। মনোরঞ্জন সদ্য বিবাহিত। সেই নিষেধ অমান্য করার পরিণাম নির্মম। সারা উপন্যাসে আর কোথাও সে নেই। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এছাড়া তার স্ত্রীর কঠিন জীবনসংগ্রামের কথা আছে। আছে পরিমল মাস্টার আর সুলেখা দিদিমণির কো-অপারেটিভ গঠন, সুন্দরবনের আর্থসামাজিক নিরাপত্তার জন্য গ্রামসভা, মহিলা সমিতি, গ্রুপ ইনসিওরেন্স গঠনের কথা। তাদের রাজনৈতিক জীবন বৃত্তান্তের কথা। ঔপন্যাসিক চেয়েছিলেন সুন্দরবনের নদীকেন্দ্রিক অঞ্চলের জনজীবনের ছবি আঁকতে। কিন্তু যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা থাকলে তা সম্পন্ন হওয়ার কথা তা ছিল না। তার পূরণ তিনি ঘটিয়েছেন কল্পনা দিয়ে। যেমন নদীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন— "নদীর ওপারের আকাশ খুনখারাবি লাল, নদীর জলে লম্বা লম্বা লকলকে লাল শিখা, কিছু দূরে একটি পালতোলা নৌকা এখন ক্যালেন্ডারের ছবি হয়ে গেছে। লালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশের বাকি অংশও প্রগাঢ় নীল।" সব মিলিয়ে এই উপন্যাসে তিনি যাদের কথা বলেছেন তাদের সঙ্গে সুন্দরবনের যোগ ঘনিষ্ঠ নয়। অর্থাৎ নদী তাদের নিয়ন্তা নয়। তাই বাস্তব জীবনরস অপেক্ষা রোমান্সের প্রাধান্য এই উপন্যাসে বেশি।

বেতনা তীরবর্তী নিগৃহীত মালোদের ব্যর্থ জীবনের কাহিনি নিয়ে লেখা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'গহীন গাঙ'। লেখক সুন্দরবনের অরণ্য, নদী এবং মানুষদের জীবনসংগ্রামের ছবি প্রত্যক্ষ করে উপন্যাসের মধ্যে তা জীবন্ত

করে তুলেছেন। এখানে মালোদের গ্রাম এ বিধবাপল্লির কথা আছে। যেখানে মানুষ বার্ধক্যে পৌঁছনোর আগেই জীবন শেষ হয়ে যায়। জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে মরতে হয় বহু মানুষকে। ললিত বর্মন সেইরকম এক চরিত্র। জীবিকার প্রয়োজনে বনে গিয়ে বাঘের পেটে জীবন যায় তার। তার দুই ছেলে। এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে তার স্ত্রী ভেঙে পড়ে। কিন্তু মালোদের জীবনে বসে খাওয়ার রীতি নেই। নিরুপায় হয়ে আগের মতো জীবনের লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হয়। তারা বেতনার জল থেকে মাছ ধরে তা খটিদারদের কাছে বিক্রি করে। সেই মাছ লঞ্চে করে নদীপথে এনে ক্যানিংয়ের মোকামে এ চালান দেয়। শহরের সঙ্গে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম লঞ্চ। নদীপথে কোনও সমস্যা হয়ে লঞ্চ বন্ধ হয়ে গেলে খটিদাররা মাছ কেনা বন্ধ করে দেয়। সেইরকম একজন খটিদার আব্দুল যে লঞ্চের ভয় দেখিয়ে জেলেদের শোষণ করতে থাকে। শুধু শোষণ নয়, খটিদারা মালিক শ্রেণির সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করে জেলেদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। এদের শাসন- শোষণের যুক্ত হয় মেদিনীপুর থেকে আগত ঈশ্বর। সবাই মিলে তাদের জীবন থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। মালোরা খটিদেরদের চটাতে পারে না। কারণ তারা জানে, ওদের চটালে তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে। তবু প্রতিবাদ হয়। তারই প্রমাণ ললিত বর্মন ও তার ছেলে শ্রীপদ। এরাই প্রথম আব্দুলের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের জাল, নৌকা তৈরি করে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এরা খটিদারদের কাছে মাছ বিক্রি না করে কো-অপারেটিভে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সেখানে যাওয়ায় শখ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেয় আব্দুল। মিথ্যা দেনার দায় তার ওপরে চাপিয়ে তাকে নিঃস্ব করে দেয়।

স্বল্পায়তনের এই উপন্যাসের মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলের নদী সমন্বিত সমাজের ছবিকেই লেখক সহমর্মিতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পাশাপাশি যেমন ধর্ম, লোকাচারের কথা আছে, তেমনই তার থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতাও আছে। তাই তো শ্রীপদ তার বাবার মৃত্যুর পরে তার কুশপুত্তুল পোড়ায়নি। আধুনিকতায় যাদের বলা হয় বলে সাব-অল্টার্ন, এই উপন্যাসে আছে তাদের জীবনের সমস্যার কথা। আধিপত্যবাদী সমাজব্যবস্থায় দরিদ্র, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মালোদের জীবনসংগ্রাম ও সমকালীন সমাজ বাস্তবতার যে ছবি লেখক এঁকেছেন অবশ্য পাঠ্যযোগ।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা এবং এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া আদিগঙ্গাকে কেন্দ্র করে লেখা আরও একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল শচীন

দাসের 'অন্ধ নদীর উপাখ্যান'। প্রায় দুশো বছর আগে আদিগঙ্গার যে ধারাটি দক্ষিণবঙ্গে আদিগঙ্গা নামে পরিচিত ছিল, যে জলপ্রবাহে একসময় ব্যবসার কারণে পর্তুগিজরা এসেছিল, যেখানে বন্দর, জাহাজ তৈরির ঘাট হয়েছিল, যে ধারাপ্রবাহের তীরভূমিতে চৈতন্যদেব গড়িয়া, হরিণাভি, কালীক্ষেত্র, ছত্রভঙ্গ হয়ে নীলাচলে গিয়েছিলেন, সেই হারিয়ে যাওয়া আদিগঙ্গা ও তার দুই তীরে গড়ে ওঠা জনজীবনের কথা আছে এই উপন্যাসে। বাংলা কথাসাহিত্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নদীগুলিকে কেন্দ্র করে যত উপন্যাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটির আলোচনা করে, সেখানে নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জীবন কীভাবে, কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। কালের গতির সঙ্গে, সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে, নদীর বা প্রকৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যজীবি মানুষের জীবিকার যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তারও উল্লেখ করেছি। সামগ্রিকভাবে নদ-নদী তার দু'পাশে বসবাসকারী মানুষজন, তাদের সংস্কার, আচার-আচরণ, পেশা, সব কিছুই আমাদের সাহিত্যে যে প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হয়েছে তারই পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

এখানে যে সমস্ত উপন্যাস আলোচিত হয়েছে তা সবই নদী নিয়ন্ত্রিত উপন্যাস। নদীকে কেন্দ্র করে ঘটনার বিস্তার। চরিত্রের বিবর্তন, নদীনির্ভর অর্থনীতি, নদী সংস্কৃতির নানা দিকও ন্যান দিকও এইসব উপন্যাসে রয়েছে। যার ফলে বাস্তবতার দাবিই শুধু স্বীকৃত হয়নি, সেইসঙ্গে এখানকার মেহনতি মানুষের একাংশের জীবনের একটি রূপরেখা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে এইসব উপন্যাস সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধের ইতিহাস। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নদীনির্ভর এইসব মানুষের সামনে একটাই বিকল্প পথ খোলা ছিল— নদীক জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা। যার প্রধান উপকরণ নদী, নৌকা আর জাল। যদিও এদের বেশিরভাগেরই তা নেই। জমিদার, মহাজনের শোষণে এরা নিঃস্ব, মাঝিরা সম্পূর্ণ জনমজুর এবং নিরক্ষর। আর্থিকভাবে এরা অনেক পিছিয়ে। অনিশ্চিত এবং অন্ধকার ভবিষ্যতের হাত থেকে এদের নিস্তার সুদূর পরাহত।

নদীনির্ভর লোকসমাজ তাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষ সাধন করতে চায় তা এক ক্রমান্বিত অগ্রগতির ইতিহাস। যে ইতিহাসে আছে শ্রম, ধ্যান-অনুধ্যান ও শিল্পিত স্বভাবের দীর্ঘকালের অনুশীলন। কিন্তু তা সাধারণ গ্রামীণ লোকজীবনচর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এইসব উপন্যাস পড়লে তার প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে দেখা দেয় নদীনির্ভর কাহিনিতে রোমান্টিকতা

ও বাস্তবতা সুন্দরভাবে মিলে গেছে। কোনওটির প্রাধান্য আমাদের রসাস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করে না।

ঔপন্যাসিকরা এইসব উপন্যাসে নদীর উপস্থিতির বৈচিত্র্য যথাযথভাবে ব্যবহার করে উপন্যাসকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। পাশাপাশি পাঠকের মনে গভীর আগ্রহ জাগাতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে নদীর রূপ ও স্বরূপ যেমন লক্ষণীয় তেমনই নদীর ইতিহাস প্রসঙ্গ উপন্যাসগুলিকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা উপন্যাসের ভাণ্ডারও যে সমৃদ্ধ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস শুধু সাহিত্যরসপিপাসু পাঠক নয়, অর্থনীতিবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, লোকসংস্কৃতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক সবার কাছেই আকর্ষণীয়। এইসব উপন্যাস থেকে বাঙালি পাঠক পেয়েছেন নতুন গল্পরসের স্বাদ। নদীকেন্দ্রিক মানুষজন, তাদের জীবনচর্চা ও জীবনের সমস্যার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর এইসব বাংলা উপন্যাসে নদী ও নদীনির্ভর জনজীবনের যে পরিচয় রয়েছে যে পরিচয় রয়েছে তার বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য।

সহায়ক গ্রন্থ :

মনোজ বসু— 'জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত,
শক্তিপদ রাজগুরু — 'নোনা গাঙ', 'রায়মঙ্গল'
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়— 'বাগদা',
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — 'জল জঙ্গলের কাব্য',
প্রফুল্ল রায় — 'মাটি আর নেই',
শচীন দাশ — 'অন্ধ নদীর উপাখ্যান',
সাধন চট্টোপাধ্যায় — 'গহীন গাঙ',
শিবশংকর মিত্র — 'বেদে বাউলে',

পরিচিতি :

অতিথি অধ্যাপক, আল আমিন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ISBN : 978-98-83200-22-4

Rs. 300